গুরু স্থান

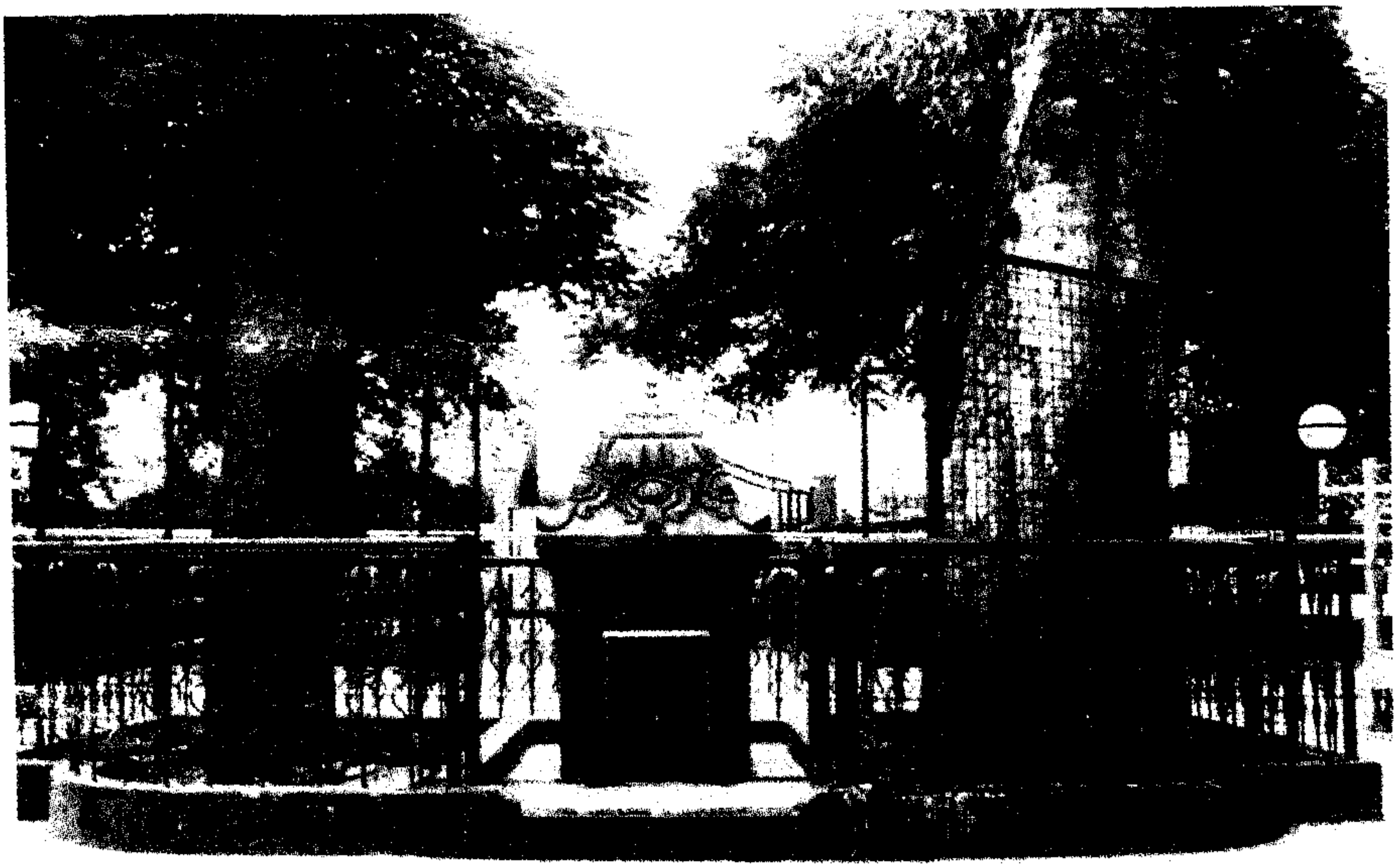

নন্দা দ্বীপ

চাওড়ী

দ্বারকামাঈ

অধ্যায় - ১১

সগুণ ব্রহ্ম শ্রী সাইবাবা, ডাক্তার পণ্ডিতের পূজো, হাজী সিদ্দীক ফালকে, তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ।

সগুণ ব্রহ্ম শ্রী সাইবাবা ঃ-

ব্রহ্মের দুইটি স্বরূপ - নির্গুণ ও সগুণ। নির্গুণ নিরাকার হয় ও সগুণ সাকার। যদিও দুটিই একই ব্রহ্মের দুই রূপ, তবুও কারো নির্গুণ উপাসনা তো কারো সগুণ উপাসনা রুচিকর মনে হয় - যেমনটি গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সগুণ উপাসনা সরল ও শ্রেষ্ঠ। মানুষের আকার আছে। তাই তার ঈশ্বরের সাকার উপাসনা স্বভাবতঃই সরল মনে হয়। কিছুকাল সগুণ উপাসনা না করলে প্রেম ও ভক্তিতে বৃদ্ধি হয় না। যেমন-যেমন সগুণ উপাসনায় আমাদের উন্নতি হতে থাকে, তেমন-তেমন নির্গুণ ব্রহ্মের দিকে আমরা অগ্রসর হতে থাকি। তাই সগুণ উপাসনা দিয়েই শুরু করা উচিত। মূর্তি, বেদী, অগ্নি, আলো, সূর্য্য, জল এবং ব্রাহ্মণ ইত্যাদি উপাসনার বস্তু হওয়া সত্বেও সদ্‌গুরুই এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শ্রী সাইয়ের স্বরূপ চোখের সামনে আনুন-যিনি বৈরাগ্যের প্রত্যক্ষ মূর্তি এবং অনন্যয়ী শরণাগত ভক্তদের আশ্রয়দাতা। তাঁর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর পূজোর সংকল্পের দ্বারাই সমস্ত ইচ্ছা আপনা-আপনি পূরন হয়ে যায়।

কেউ-কেউ শ্রী সাইবাবাকে এক 'ভগবৎভক্ত' বা 'মহাভক্ত' বলেই মানত বা মানে। কিন্তু আমাদের জন্য তো উনি ঈশ্বরাবতার। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, শান্ত ও সরল ছিলেন, যার কোন উপমাই দেওয়া যায় না। যদিও তিনি দেহধারী ছিলেন, কিন্তু আসলে নির্গুণ, নিরাকার, অনন্ত ও নিত্যমুক্ত। গঙ্গা নদী সমুদ্রের দিকে যাওয়ার পথে গ্রীষ্মের উষ্ণতার দ্বারা আক্রান্ত প্রাণীদের শীতলতা প্রদান করে সুখী করে। ঠিক সেই রকমই শ্রী সাই জীবিত কালে অন্যদের সান্ত্বনা ও সুখ প্রদান করতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন- "সন্তই আমার আত্মা।" এই অবর্ণনীয় ঈশ্বরীয় শক্তিগুলি - সত্, চিত্ত, আনন্দ শিরডীতে সাই রূপে অবতীর্ণ হয়েছিল। শ্রুতিতে (তৈত্তিরীয় উপনিষদ) ব্রহ্মকে 'আনন্দ' বলা হয়েছে। আজ অবধি এ কথা কেবল বইতেই পড়েছি বা শুনেছি। কিন্তু ভক্তগণ

শিরডীতে এই আনন্দ প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন। বাবা সবার আশ্রয়দাতা ছিলেন, তাঁর কারো সাহায্যের প্রয়োজন হত না। তাঁর বসার জন্য ভক্তগণ একটা মোলায়েম (নরম) আসন ও একটা বড় বালিশ রাখত। বাবা ভক্তদের মনোভাব শ্রদ্ধা করতেন এবং তাদের ইচ্ছানুসারে পূজানাদি করাতে কোন রকম আপত্তি করতেন না। কেউ আতর ও চন্দন লাগাত তোকেউ সুপূরী-পান ও অন্যান্য বস্তু অর্পণ করত, কেউ বা নৈবেদ্য। যদিও দেখে মনে হত যে শিরডীই তাঁর বাসস্থান, কিন্তু আসলে তিনি তো ছিলেন সর্বব্যাপী। এইরূপ সর্বব্যাপী গুরুদেবের চরণে আমার বারম্বার প্রণাম।

ডাক্তার পণ্ডিতের ভক্তি ঃ-

একবার শ্রী তাত্য়া নুলকরের বন্ধু ডাক্তার পণ্ডিত বাবার দর্শনার্থে শিরডী আসেন। বাবাকে প্রণাম করে উনি মস্‌জিদে কিছুক্ষণ বসেন। বাবা ওঁকে শ্রী দাদাভট্ট কেলকরের বাড়ী যেতে বলেন, যেখানে ওঁর খুব ভালো অভ্যর্থনা হয়। তারপর দাদাভট্ট ও ডাক্তার পণ্ডিত একসাথে বাবার পূজোর জন্য মস্‌জিদে পৌঁছন। প্রথমে দাদাভট্ট বাবার পূজো করেন। বাবার পূজো-অর্চনা তো প্রায় সবাই করত, কিন্তু তাঁর শুভমস্তকে চন্দন লাগাবার সাহস কখনো কারো হয়নি। শুধু মহালসাপতি তাঁর গলায় চন্দন লাগাতেন। কিন্তু সেদিন ডাক্তার পণ্ডিত পূজোর থালা থেকে চন্দন নিয়ে বাবার কপালে ত্রিপুণ্ডাকার এঁকে দেন। বাবা একটি শব্দও বললেন না। ভক্তরা অবাক হয়ে এই দৃশ্যটি দেখল। সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার ভট্ট আর থাকতে না পেরে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন- "আপনি তো কাউকে কপালে চন্দন লাগাতে দেন না, কিন্তু ডাক্তার পণ্ডিতকে কেন কিছু বললেন না?" বাবা এর উত্তরে বললেন- "ডাক্তার পণ্ডিত তাঁর গুরু শ্রী রঘুনাথ মহারাজ ধোপেশ্বরকে (যিনি কাকা পুরানীকের নামে প্রসিদ্ধ) যেরূপ চন্দন লাগাতেন, ঠিক সেই ভাবনায় বশীভূত হয়ে আমার কপালে চন্দন লাগান। এবার বলো, আমি কি করে তাঁকে বাধা দিতাম? ডাক্তার পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করাতে উনি দাদাভট্টকে বললেন- "আমি বাবাকে নিজের গুরু কাকা পুরানীকের ন্যায় মেনে তাঁকে চন্দন লাগিয়ে ছিলাম, যে রূপ আমি আমার গুরুকে লাগাই।"

যদিও বাবা ভক্তদের তাদের ইচ্ছেমত পূজো করতে দিতেন, তবুও কখনো-কখনো তাঁর ব্যবহার অদ্ভুত ও বিস্ময়কর মনে হত। যখন তিনি পূজোর থালা ফেলে দিয়ে রুদ্রাবতার ধারণ করতেন, তখন তাঁর কাছে যাওয়ার সাহস কারো হত না। কখনো তিনি ভক্তদের বকতেন, তো কখনো মোমের চেয়েও নরম হয়ে শান্তি ও ক্ষমামূর্তির ন্যায় ব্যবহার করতেন। কখনো-কখনো রাগে কাঁপতেন ও তাঁর চোখ দুটি লাল হয়ে

যেত, তবুও তাঁর হৃদয়ে প্রেম ও মাতৃস্নেহের স্রোত বইত। ভক্তদের কাছে ডেকে বলতেন যে তিনি তো জানতেই পারেননি যে, কোন্ সময় তিনি তাদের উপর রেগে উঠেছিলেন। বাবা সমুদ্রের ন্যায় ভক্তরূপী নদীগুলির উপর রাগ করে কখনো কি তাদের ফিরিয়ে দিতে পারেন বা তাদের উপেক্ষা করতে পারেন? তিনি তো ভক্তদের কাছেই থাকেন ও ভক্তরা যখন তাঁকে ডাকে তিনি তক্ষুনি সেখানে উপস্থিত হয়ে যান। তিনি সর্বদাই ভক্তদের ভালবাসার পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে থাকেন।

হাজী সিদ্দীক ফালকে ঃ-

কখন শ্রী সাইবাবা কোন্ ভক্তকে নিজের কৃপাছায়ায় টেনে নেবেন সেটা কেউই বলতে পারত না। এটা শুধুমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করত। হাজী সিদ্দীক ফালকের কাহিনী এই সত্যেরই একটি উদাহরণ। কল্যাণনিবাসী এক মুসলমান, যাঁর নাম সিদ্দীক ফালকে ছিল, মক্কা শরীফের 'হজ' যাত্রা করে শিরডী আসেন। তিনি চাওড়ীর উত্তর দিকে থাকতে শুরু করেন। মস্‌জিদের সামনে খোলা উঠোনটায় বসতেন। বাবা ওঁকে ন'মাস মস্‌জিদে প্রবেশ করার অনুমতি দেননি। এমনকি মস্‌জিদের সিঁড়িও চড়তে দেননি। ফালকে খুবই নিরাশ হন এবং উনি এটা ভেবে উঠতে পারেন না যে কোন্ উপায় কার্য্যকরী হতে পারে। লোকেরা ওঁকে নিরাশ না হয়ে বাবার অন্তরঙ্গ ভক্ত শামার সাহায্যে বাবার কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করতে বলে। যেভাবে ভগবান শিবের দরবারে পৌঁছনোর জন্য নন্দীর কাছে যাওয়া আবশ্যক, তেমনি বাবার কাছেও শামার মাধ্যমেই যাওয়া উচিত। ফালকের এই পরামর্শটি ভালো লাগে এবং উনি শামাকে মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ করেন। শামাও তাঁকে আশ্বাস দেন এবং সুযোগ পেয়ে বাবাকে বললেন- "বাবা, আপনি এই বুড়ো হাজীকে মস্‌জিদে কেন ঢুকতে দিচ্ছেন না? কত ভক্ত ইচ্ছেমত আপনার দর্শন করতে আসে-যায়। কিছু না হোক, একবার ওঁকে আশীষ তো দিয়ে দিন।" বাবা বললেন- "শামা, তুমি এখনো অবুঝ আছো। যদি ফকির (আল্লাহ্) অনুমতি না দেন, তাহলে আমিই বা কি করি? তাঁর কৃপা ছাড়া কেউ এই মস্‌জিদের সিঁড়ি চড়তে পারে না। আচ্ছা ওকে জিজ্ঞেসা করো, যে ও কি দ্বাদশ কূপের কাছে নীচু সংকীর্ণ রাস্তাটায় আমার সাথে দেখা করতে পারে?" শামা সম্মতিসূচক উত্তর নিয়ে ফেরেন। তখন বাবা আবার শামাকে বলেন- "ও কি আমায় চারটে কিস্তিতে চল্লিশ হাজার টাকা দিতে রাজী আছে?" শামা এই উত্তর নিয়ে ফেরেন যে. আপনি যদি চল্লিশ লাখ টাকাও চান তো দিতে রাজী আছি। "আমি একটা পাঁঠা কাটতে চাই, ওকে জিজ্ঞাসা করো যে, ও তার মাংস খেতে চায় না তার অণ্ডকোষ?" শামা এসে

জানান যে, বাবার খাবার পাত্র থেকে একটি গ্রাস পেলেই হাজী নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে। এই উত্তরটি শুনে বাবা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং মাটির ঘড়াটা ফেলে দিয়ে নিজের কফ্‌নীটা (খাপনি) উপরে উঠিয়ে সোজা হাজীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। "শুধু-শুধু নমাজ কেন পড়ো? নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন কেন করো? এ রকম বৃদ্ধ হাজীদের মত বেশভূষা কেন ধারণ করে আছো? এই রকম কোরান পড়েছ তুমি? তোমার নিজের মক্কা যাত্রার অহংকার হয়ে গেছে, কিন্তু তুমি এখনো আমায় চেনোনি।" এই ভাবে বকুনি খেয়ে হাজী ঘাবড়ে গেল। বাবা মস্‌জিদে ফিরে আসেন এবং কিছু আমের টুকরী কিনে হাজীর কাছে পাঠিয়ে দেন। এরপর থেকেই বাবা হাজীকে ভালবাসতে শুরু করেন এবং একত্রে বসে খাবার খাওয়ার জন্য ডাকতেন। এবার হাজীও নিজের ইচ্ছানুযায়ী মস্‌জিদে আসা-যাওয়া শুরু করেন। কখনো-কখনো বাবা ওঁকে কিছু টাকাও দিতেন। এই ভাবে হাজী বাবার দরবারে সম্মিলিত হয়ে যান।

বাবার তত্ত্ব (প্রকৃতির শক্তি) নিয়ন্ত্রণ ঃ-

বাবার তত্ত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ স্বরূপ দুটি ঘটনা উল্লেখ করে এই অধ্যায়টি শেষ করা হচ্ছে -

১) একবার সন্ধ্যার সময় শিরডীতে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হয়। আকাশ ঘন ও কালো মেঘে ঢাকা ছিল। খুব জোরে হাওয়া বইছিল এবং বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। যেদিকেই চোখ যায়, সেদিকেই শুধু জল। সব পশু-পাখী ও শিরডীবাসীরা ভয়ানক ভয় পেয়ে মস্‌জিদে একত্রিত হয়েছিল। শিরডীতে গ্রামদেবী তো অনেক আছেন, কিন্তু ঐ দিন সাহায্য করতে কেউ এলেন না। তাই সবাই নিজেদের ভগবান শ্রী সাইকে, যিনি শুধু তাদের ভক্তি একান্ত ভাবে কামনা করতেন, বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য প্রার্থনা করে। বাবা তাদের ভক্তিতে মুগ্ধ ও বিচলিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। মস্‌জিদের উঠোনে দাঁড়িয়ে, মেঘের দিকে তাকিয়ে, গম্ভীর স্বরে বলেন- "ব্যস্‌, এবার শান্ত হও।" কিছুক্ষণ পরই বৃষ্টির জোর কম হয়ে পড়ে এবং ঝড় শান্ত হয়ে যায়। আকাশে চাঁদ দেখে সব লোকেরা প্রসন্ন মনে নিজের-নিজের বাড়ী ফিরে যায়।

২) আরেক দিন মধ্যাহ্নের সময় ধুনির আগুন এতো প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে নিয়েছিল যে অগ্নিশিখা ছাদ ছুঁতে লাগল। মস্‌জিদে উপস্থিত লোকেরা বুঝে উঠতে পারছিল না যে, জল ঢেলে ধুনির আগুন শান্ত করে দেওয়া উচিত অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত। বাবাকে জিজ্ঞাসা করার সাহস কারো ছিল না।

কিন্তু বাবা শীঘ্রই পরিস্থিতিটি জানতে পেরে যান। তিনি নিজের দণ্ডটি উঠিয়ে সামনের থামের উপর সজোরে আঘাত করে বলতে লাগলেন- "নীচে নামো ও শান্ত হয়ে যাও।" প্রত্যেক আঘতের প্রভাবে শিখাগুলির প্রচণ্ডতা কম হতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুনি শান্ত ও আগের রূপ ধারণ করে। শ্রী সাই ঈশ্বরের অবতার। যে তাঁর সামনে নত হয়ে তাঁর শরণে যাবে, তিনি তার উপর অবশ্যই কৃপা করবেন। যে ভক্ত এই অধ্যায়ের কাহিনীগুলি প্রতিদিন শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক পাঠ করবে, সে দুঃখ হতে শীঘ্রই পরিত্রাণ পাবে। শুধু তাই নয়, সে সর্বদাই শ্রী চরণে লিপ্ত থাকবে। অল্প সময়ের মধ্যেই ঈশ্বর দর্শন প্রাপ্ত হয়ে তার সমস্ত ইচ্ছে পুরণ হয়ে যাবে এবং এই রূপ সে নিষ্কাম হয়ে যাবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।